গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৩ সংখ্যা - ৩/৪ জুলাই-আগষ্ট ২০১৬ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

সৌরজগতে নতুন গ্রহ (?)

গোবিন্দ দাস

সৌরজগতে নাকি নতুন এক গ্রহের খোঁজ পাওয়া গেছে। যদিও কোনোভাবেই তাকে এখনো টেলিস্কোপে ধরা যায়নি। খালি চোখে দেখার কথা ভাবাই যায় না। প্রস্তাবিত নতুন গ্রহটির নাম আপাতত দেওয়া হয়েছে 'প্ল্যানেট ৯'। টেলিস্কোপে দেখা সম্ভব হলে, তখন একটা ভালো নাম দেওয়া যাবে রোমান বা গ্রীক পুরান থেকে। ২০১৬ সালের ২০ জানুয়ারী তারিখে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজির দুই

এরপর 3 পাতায়

গণিতে আনন্দ

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

সংখ্যাময় এই সৃষ্টি। পৃথিবী থেকে গ্রহ তারার দূরত্ব হোক কিংবা ভোটার কার্ডের আই ডি নম্বর অথবা সময়ের হিসাব, সবই সংখ্যার খেলা। আমাদের চেনা অচেনা সৃষ্টির কণায় কণায় সংখ্যার খেলা প্রতিনিয়ত ঘটমান। আর এই নিত্য খেলায় রথী-মহারথীর সংখ্যাও অসংখ্য।

এমনই এক সংখ্যা সাধকের নাম দত্তরায়া রামচন্দ্রা কাপ্রেকার। বিংশ শতাব্দীর ভারতে নাসিকের নিকটবর্তী দেওলালি শহরের স্কুল শিক্ষক, যিনি আজীবন গণিত সাধনায় মগ্ন ছিলেন

এরপর 4 পাতায়

রাইসিন : একটি জৈবসন্ত্রাসকারী পদার্থ

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

১৯৭৮ এর ৭ই মে। অন্য আর পাঁচটা দিনের মতোই কর্মব্যস্ত লন্ডনের রাস্তাঘাট। ৪৯ বছরের বিখ্যাত বুলগেরিয়ান লেখক জিয়ার্জি মার্কভ (Georgi Ivanov Markov) তার গাড়িটি সবে ওয়াটারলু ষ্টেশনের কাছে পার্ক করেছেন এবং অপেক্ষা করছেন বাস ধরবেন বলে। আসলে তিনি যাবেন শহরের বিখ্যাত টেমস্ নদী পার হয়ে বুশ হাউসে। সেখানেই বিবিসি ওয়ার্লড সার্ভিসে তিনি কাজ করেন। আচমকা এক পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি তার পড়ে যাওয়া হাতের ছাতাটি ফুটপাত থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন। যদিও মার্কভ বুঝতে পারলেন না যে আসলে ওই ছাতা থেকেই এয়ারগান সদৃশ প্রযুক্তিতে একটি ধাতব টুকরো ছোড়া হয়েছে যা আকারে একটি আলপিনের মাথার মতো, আর তা বহন করছিলো

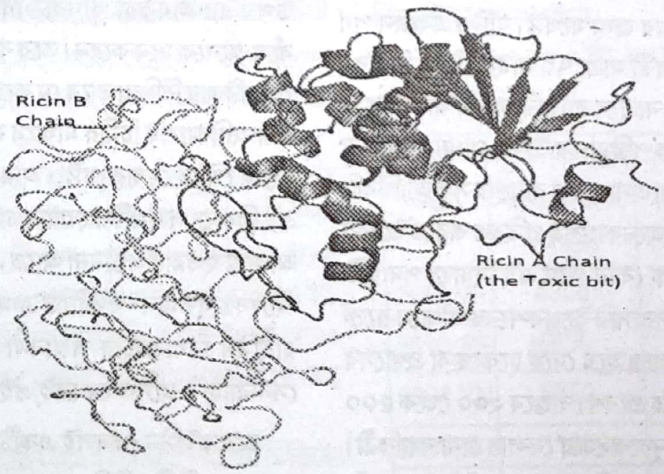

একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক বিষাক্ত পদার্থ। অবশেষে বিকেলে মার্কভ যখন দক্ষিণ লন্ডনের বাল্‌ম-এ নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন তখন তিনি রীতি মতো অসুস্থ। মার্কভ বমি করতে শুরু করলেন, সাথে তীব্র জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ঠিক চারদিনের মাথায় নিদারুণ যন্ত্রণার শেষে হাসপাতালের ইন্‌টেন্সিভ কেয়ারে থাকা অবস্থায় তিনি মারা গেলেন। মার্কভের মৃত্যু রহস্য নিয়ে সেই সময় ইউরোপ ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে অনেক জলঘোলা হয়েছিলো। কিন্তু কি সেই পদার্থ যা এত নির্মমভাবে একজন সুস্থ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে? প্রাকৃতিক বিষ

এরপর 2 পাতায়

মৌমাছি ও মধু

কাননকুমার প্রামাণিক

মৌমাছি-ডানায় গুন গুন শব্দ আমাদের সবার পরিচিত। দূর দূরান্ত থেকে ফুলের মকরন্দ (Nector) সংগ্রহ করে আনে এবং বাসায় এনে উগরে ডানার দ্বারা বাতাস করে মধু (Honey)তে পরিণত করে। যা আমরা মধু হিসাবে খাই। মধু চট্‌চটে, স্বাদে মিষ্টি। গাঢ় বাদামি রং। সুগন্ধ যুক্ত। মৌমাছি ফুলের মকরন্দ সংগ্রহ করে বাসায় আনে শীতকালে তাদের নিজেদের খাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই মধু আমরা খাই। মধু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ক্যালরি ৩১৯

এরপর 6 পাতায়

ভুরিভোজের পরে

তাপস মজুমদার

একটা চোঁয়া ঢেকুড় উঠল। আপনি দ্বিপ্রাহরিক কিংবা রাত্রির ভারী খাবার খেয়েছেন। আপনি তৃপ্ত। এই তৃপ্ত আমেজকে আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী করতে চাইলেন। তাই আপনি এমন কিছু করলেন যাতে ভারী খাওয়ার পরেও আমেজটা থেকে যায়। কিন্তু আপনি বুঝতেও পারলেন না খাওয়ার পরের এই কাজ আপনার শরীরের বিপদ ডেকে আনল। যেমন —

১) ধূমপান ঃ- বেশীর ভাগ ধূমপায়ির নিত্যদিনের অভ্যাস ভারি খাদ্য গ্রহণের পরেই ধূমপান। এতে তারা অতিরিক্ত আমেজ পান। কিন্তু তারা জানেন না খাওয়া দাওয়ার পর

এরপর 7 পাতায়

রাইসিন

1 পাতার পর

বলতে প্রথমেই তো আমাদের সাপের বিষের কথা মনে আসে। কিন্তু এ বিষ তার চেয়ে অনেক অনেক গুন বেশী মারণকারী। আর এর প্রধান উৎস একটি গাছ আমরা আসলে রাইসিন এর কথা বলছিলাম। বেশ কিছু প্রজাতির উদ্ভিদে খুব সামান্য পরিমাণে রাইসিন তৈরী হলেও তা কোনোভাবেই প্রাণনাশের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে ক্যাস্টর বীনস্ গাছে কিন্তু এই পদার্থটি প্রচুর পরিমানে থাকে। গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Ricinus communis* ক্যাস্টর বীনস্ গাছ, যে গাছের বীনস্ পিষে ক্যাস্টর অয়েল তৈরী হয়। আর এই বীনসেই পাওয়া যায় পৃথিবীর বিষাক্ততম প্রাকৃতিক পদার্থগুলির একটি যা রাইসিন নামে পরিচিত। এর বীজে এই বিষাক্ত প্রোটিনের উপস্থিতি বিভিন্ন প্রাণীদেরকে খাদ্য হিসাবে এই বীজ গ্রহণ থেকে নিরস্ত করে। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমের পর উদ্ভিদদেহে এই রাইসিন আর পাওয়া যায় না। তবে যতক্ষণ না অঙ্কুরোদ্গম হয় ততক্ষণ এই তীব্র বিষ রাইসিনের উপস্থিতি বীজপত্রে অবশ্যই থাকবে।

যে কোনো বিষাক্ত পদার্থের বিষাক্ততার মাত্রা সাধারণভাবে Median lethal dose (LD_{50} -বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি যে কোন বিষাক্ত পদার্থের যে মাত্রায় (Dose) কোন জীবের জন সংখ্যার অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যায়, তাকে সেই বিষাক্ত পদার্থের LD_{50} বলা হয়) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন প্রাণী সংহারক পদার্থগুলির মধ্যে নার্ভ গ্যাস অন্যতম। আর সবচেয়ে সাংঘাতিক নার্ভ গ্যাসের (যেগুলি কখনো কখনো রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে) ক্ষেত্রে LD_{50} এর মান দেহ ওজনের প্রতি কেজিতে ২০ মাইক্রোগ্রাম, কিন্তু রাইসিনের ক্ষেত্রে এই মাত্রা হল ০.১ মাইক্রোগ্রাম। অর্থাৎ এই হিসাব অনুযায়ী ৭০ কেজি ওজনের কোনো মানুষের ক্ষেত্রে মাত্র ৭ মাইক্রোগ্রাম রাইসিন জীবন বিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। যদিও একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে রাইসিনের প্রাণঘাতী মাত্রা ৭০ মাইক্রোগ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছে যা LD_{50}-র ১০ গুন। তবে বাস্তবে ব্যক্তির অন্যক্রম্যতার কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনলে এই মাত্রার অধিক পরিমাণ রাইসিন প্রাণনাশের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। কারণ দেহের অন্যক্রমতা ব্যবস্থায় সৃষ্ট অ্যান্টিবডি দেহে প্রবেশ করা রাইসিনের কার্যকারিতা অনেকাংশেই প্রতিহত করতে উদ্দেগী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও তা নির্ভর করে ঠিক কোন পথে এই বিষাক্ত পদার্থটি দেহে প্রবেশ করেছে তার উপর। অর্থাৎ সরাসরি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রক্তে মিশেছে, নাকি খাবারের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্র হয়ে দেহে ঢুকেছে বা প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে এর জীবদেহে প্রবেশ। বাস্তবে ২০০ থেকে ৫০০ মাইক্রোগ্রাম রাইসিন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে মেরে ফেলার জন্য কার্যকরী। কিন্তু এই পরিমাণও খুবই সামান্য যার কয়েকটি মাত্রা খুব সহজেই একটি আলপিনের মাথায় এটে যেতে পারে। তবে তুলনামূলক বিচারে প্রাণনাশের জন্য বেশী পরিমাণ রাইসিন প্রয়োজন হয় যদি তা খাবারের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু যেভাবেই শরীরে ঢুকুক না কেন প্রতিক্রিয়া হিসাবে খুব দ্রুত দেহের অনেকগুলো অঙ্গে একসাথে এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। এই প্রাণঘাতী বিষটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মোটামুটি ৬ ঘন্টা পর থেকে দেহে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যেতে থাকে। প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণঘাতী পরিমাণ রাইসিনের প্রভাবে শ্বাসকষ্ট এবং জ্বর শুরু হয়। ফুসফুসে তরল জমতে শুরু করায় শ্বাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকায় দেহের চামড়ার রং নীলচে কালো হয়ে আসে, যার আবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু। খাবারের মাধ্যমে এই বিষাক্ততা হলে রোগী বমি, ডায়রিয়া ও রক্তচাপ হ্রাসের সাথে সাথে দেহে আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ শুরু হয়। দুই-এক দিনের মধ্যেই লিভার, কিডনি সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। কিন্তু রাইসিন সরাসরি রক্তে মিশে গেলে মৃত্যু দ্রুততর হয় এবং পুরো প্রক্রিয়াটি ৩৬ থেকে ৭২ ঘন্টায় ঘটে। আর বিষাক্ততার মাত্রা কম হলে রোগী কমপক্ষে দিন পাঁচেক বেঁচে থাকে, তবে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

এবার একটু রসায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাইসিনের দিকে তাকানো যাক। রাইসিন হল টাইপ-২ রাইবোজোম ইনঅ্যাক্টিভেটিং প্রোটিন (RIP) শ্রেণীভুক্ত যা হলোটক্সিন (Holotoxin) হিসাবেও পরিচিত। বর্তুলাকার অনুটি রাইসিন A শৃঙ্খল এবং রাইসিন B শৃঙ্খল নামক দুটি জটিল প্রোটিন শৃঙ্খলের সমন্বয়ে তৈরী যা একটি ডাইসালফাইড বন্ধনের সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এর মধ্যে A শৃঙ্খলে ২৬৭টি ও B শৃঙ্খলে ২৬২টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ইউক্যারিওটিক কোষে রাইবোজোমের সক্রিয়তা নষ্ট করার মাধ্যমে জীবদেহের সমস্ত জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে জীবদেহকে কষ্টকর মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এই রাইসিন। যদিও প্রোটিন শৃঙ্খল A রাসায়নিকভাবে কোষের মৃত্যুর জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে কিন্তু কোনো পদার্থে এই প্রোটিন শৃঙ্খল A-র একার উপস্থিতি বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে না। আর যতক্ষণ এই A ও B শৃঙ্খল যুক্ত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ রাইসিনের বিষাক্ততাও পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। যেমন বার্লি-তে শৃঙ্খল A থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খল B-র অনুপস্থিতির জন্য বার্লির কোনরকম বিষক্রিয়া নেই।

যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমেরিকান সেনাবাহিনী সম্ভাব্য রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে রাইসিন নিয়ে গবেষণা করে গেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের উপর এর কার্যকরী পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নানা ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে বর্তমান শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলোতে বিশেষত আমেরিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে যে কয়েকটি রাইসিন আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই চিঠির মাধ্যমে রাইসিন পাউডার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা। আর সবচেয়ে সাংঘাতিক তথ্য হলো এখনো পর্যন্ত এই বিষাক্ত পদার্থটির কোনো প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু রাইসিন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তিদের জন্য টিকার বন্দোবস্ত আছে। বিশেষত বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান জঙ্গী কার্যকলাপের পাশাপাশি এই রাইসিন বিষাক্ততার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জঙ্গী দমনে নিযুক্ত সেনাবাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই এই রাইসিন প্রতিষেধক টিকা নিয়ে থাকেন।

তবে রাইসিন কেবলই একটি খারাপ পদার্থ তা কিন্তু নয়। অতীতে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়কারী হিসাবে সামান্য পরিমাণ ক্যস্টরঅয়েল খাওয়ার রীতি চালু ছিলো। ক্যস্টরঅয়েলের কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়কারী গুণের জন্য দায়ী পদার্থটি কিন্তু এই রাইসিন। যদিও ঝুঁকিপূর্ণ এই পদার্থের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে ডাইরিয়া ও ডিহাইড্রেশনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাছাড়া গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী ডাক্তারিশাস্ত্রে বিশেষ করে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করতে বিশেষভাবে কার্যকারী হয়ে উঠতে পারে এই রাইসিন মধ্যস্থ প্রোটিন শৃঙ্খল। আর আমরাও তাকিয়ে থাকবো এমন ভবিষ্যতের দিকে যেখানে একটি দুষ্টু অনু প্রাণরক্ষাকারী হিসাবে সভ্যতার বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

যোগাযোগ ঃ ৮৯৬৭৯৬৫৩৪০, Email : acnbul3@gmail.com

সৌরজগতে নতুন গ্রহ (?)

1 পাতার পর

বিজ্ঞানী কনস্ট্যানটাইন ব্যাটাইজিন (Konstantin) এবং মাইকেল ই ব্রাউন (Michacl E. Brown) এই 'প্ল্যানেট-৯' গ্রহটির প্রস্তাব করেন। ২০১৪ সালে নেচার পত্রিকার উদ্দেশ্যে পাঠানো এক চিঠিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্যাড ট্রুজিল্লো এবং স্কট এস শেফার্ড এই 'প্ল্যানেট ৯' -এর সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন।

ব্যাটাইজিন এবং ব্রাউনের কষা অঙ্ক দেখাচ্ছে, 'প্ল্যানেট ৯' -এর ভর ৬x১০^{২৫} কিলোগ্রাম অর্থাৎ পৃথিবীর ভরের প্রায় ১০ গুন। প্লুটোর ভরের প্রায় ৫০০০ গুন। গ্রহটির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ২ থেকে ৪ গুন। গ্রহটি যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব হয় ২০০ এ ইউ (১ এ ইউ = মোটামুটি ১৪ কোটি লক্ষ কিলোমিটার)। যখন সূর্য থেকে দূরতম বিন্দুতে চলে যায় তখন দূরত্ব দাঁড়ায় ১২০০ এ ইউ। সূর্য থেকে গ্রহটির গড় দূরত্ব ৭০০ এ ইউ। বোঝা যাচ্ছে গ্রহটির চলাফেরা কুইপার বেল্ট এবং অর্টের মেঘের মধ্যে। গ্রহটির কক্ষপথ এতটাই লম্বাটে উপবৃত্ত যে, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটির সময় নেয় ১৫০০০ বছর।

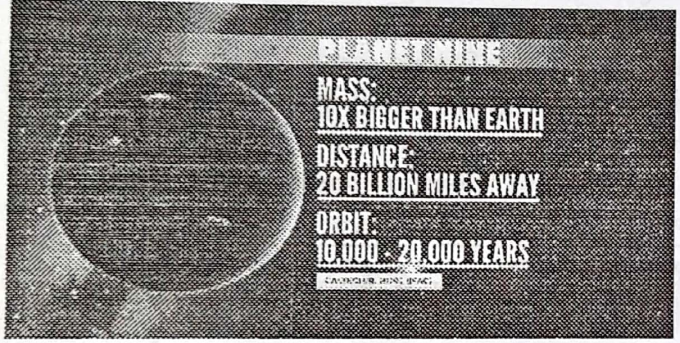

নতুন 'প্ল্যানেট ৯' এর গঠনগত উপাদান অনেকটা ইউরেনাস ও নেপচুনের মতো। অর্থাৎ পাথর ও বরফ দিয়ে তৈরী এই গ্রহ। গ্রহটিকে ঘিরে আছে গ্যাসের হাল্কা এক আবরণ।

আটটি গ্রহ, পাঁচটি বামন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা মূলতঃ এগুলি নিয়েই সূর্যের সংসার — আমাদের সৌরজগৎ। মনে হতে পারে শেষ গ্রহতেই বোধ হয় আমাদের সৌরজগতের সীমানা। তা'নয়। শেষগ্রহ নেপটুনের পরেও রয়েছে বিশাল এলাকা। শেষ গ্রহ নেপচুন আছে সূর্য থেকে ৩০ এ ইউ দূরে। ৩০ এ ইউ থেকে ৫০ এ ইউ পর্যন্ত বিস্তৃত সূর্যকেন্দ্রিক বেল্টের আকারের এলাকাটার নাম কুইপার বেল্ট। কুইপার বেল্টে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বস্তু পিন্ড।

'প্ল্যানেট ৯' এর আলোচনা শুরু হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? অঙ্কের ভিত্তিতে। নেপচুন এবং প্লুটোর আলোচনা শুরু হয়েছিল অঙ্কের ভিত্তিতেই। ইউরেনাস আবিষ্কারের অল্পকালের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল ইউরেনাস এক বেতাল গ্রহ। তার চলার পথের ছন্দ ভঙ্গ হচ্ছে। বোঝা গেল, দূরে নিশ্চয়ই কোনো অতিকায় বস্তু (গ্রহ?) আছে যার মহাকর্ষ প্রভাবের কারণে ইউরেনাসের চলার পথের এই ছন্দ পতন। খুঁজে বার করা জরুরি এই বস্তুটিকে। নতুন গ্রহটির অস্তিত্ব আর অবস্থান অঙ্ক কষে বার করলেন দুই গণিতবিদ - উরবেইন লে ভেরিয়ার এবং জে সি অ্যাডাম্স্। এঁরা অবশ্য আলাদা জায়গায় আলাদা ভাবে কাজ করেছেন। এরপর ১৮৪৬ সালে বার্লিনের এক পরীক্ষাগারে গ্রহটিকে সনাক্ত করলেন জোহান গালে এবং হেনরি ডি অ্যারেষ্ট। সামান্য আলোচনার পর এর নামও ঠিক হয়ে যায় নেপচুন।

নেপচুনের চলার পথেও সেই একই ধরণের অনিয়ম লক্ষ্য করা গেল। অঙ্কের হিসেবে তার চলার পথটা যেমন হওয়া উচিত বাস্তবে ঠিক সে রকম হচ্ছে না। সামান্য অন্য রকম! তাহলে কি আরও কোনো গ্রহ গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে আড়ালে? মনে আশা, হয়তো আরেকটা গ্রহের খোঁজ পাওয়া যাবে! পার্সিভাল লোয়েল নতুন করে গননা শুরু করলেন।... লোয়েল অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পরে, ১৯৩০ সালে কাইড টমবাগের টেলিস্কোপে ধরা পড়ল গ্রহটি। গ্রহটির নামকরণ হলো প্লুটো। বর্তমানের প্রস্তাবিত গ্রহটির অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার পেছনে জোরালো কারণ আছে কি? দেখা যাক। ২০০৩ সালের ১৪ নভেম্বর আবিষ্কৃত হল সেডনা (৯০৩৭৭ (Sedna))। আবিষ্কারক - মাইকেল ব্রাউন, শ্যাড ট্রুজিল্লো এবং ডেভিড রবিনোউইভজ সেডনা মাইনর প্ল্যানেট। নেপচুন গ্রহের পরবর্তী বস্তু। সূর্য থেকে সেডনার গড় দূরত্ব ৫০৬ এ ইউ। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সেডনা সময় নেয় ১১৪০০ বছর। সেডনার ব্যাস প্রায় ১০০০ কিলোমিটার। সেডনার কক্ষপথে কিছু বেতাল ভাব লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। বোঝা গেল কোনো অতিকায় বস্তু (গ্রহ?) এর জন্য দায়ী। ঐ অতিকায় বস্তুটি যেন সেডনাকে কুইপার বেল্ট থেকে দূরের দিকে (সূর্যের বিপরীতে) ঠেলে দিচ্ছে। নেপচুন পরবর্তী কতকগুলি বস্তুর কক্ষপথগুলির কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল ২০০৮ সালে। বিজ্ঞানী তাদাশি মুকাই এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তাব করলেন, সূর্য থেকে ১০০-২০০ এ ইউ দূর দিয়ে পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ অত্যন্ত দীর্ঘ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ১০০০ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ এবং হিসাব নিকেশ নতুন গ্রহের অস্তিত্বের পক্ষে সমর্থন জানায়। বস্তুত পক্ষে নেপচুন পরবর্তী কতকগুলি বস্তুর সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথগুলির অস্বাভাবিকতা বা বেতাল ভাবই নতুন কোনো গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা এবং হিসেব নিকেশের সূত্রপাত ঘটায়।

সূর্য থেকে ২৫০ এ ইউ এর অধিক গড় দূরত্বের বস্তুগুলি সম্পর্কে নিচের সারণিতে বলা হল।

বস্তুর নাম	সূর্যের চারপাশে আবর্তন কাল (বছর)	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (এ ইউ)	সূর্য থেকে বর্তমান দূরত্ব (এ ইউ)	প্রভাঙ্ক (বর্তমান)	ব্যাস (কিমি)
2012 VP	4300	263	83	23.4	600
2013 RF	5600	317	36.5	24.4	80
2004 VN	5850	327	48	23.3	200
200 TG	11200	501	37	21.9	200
90377 Scdna	11400	506	86	21.0	1000
2010 GB	6600	351	71	25.2	200

সারণিতে উল্লিখিত বস্তুগুলির কক্ষপথের বেতাল ভাবই নতুন কোনো গ্রহের আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। অনেক পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে নতুন নবম গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন বিজ্ঞানীরা। গ্রহটিকে টেলিস্কোপে ধরা সম্ভব হলে, সৌর জগতের গ্রহ তালিকায় একটি নতুন নাম সংযোজিত হবে। আমরা এই প্রত্যাশায় রইলাম।

যোগাযোগঃ মোঃ-৮৪২০০৪০৮৫২, Email : gcd.csms.1729@gmail.com

গণিতে আনন্দ

1 পাতার পর

কোনও প্রথাগত স্নাতকোত্তর শিক্ষার সাহায্য ছাড়াই। বিনোদনমূলক গণিত Recreational Mathematics এর ব্রতী ডি আর কাপ্রেকার পরিচিত নামেও। দেখা যাক সংখ্যার জগতে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি কী কী?

১) কাপ্রেকার ধ্রুবক ঃ- যেকোনো চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যার সব অঙ্কগুলোই সমান নয় তার অঙ্কগুলি দিয়ে গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয় করার পর যদি ঐ পদ্ধতি ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত করা হয় তাহলে এক সময় বিয়োগফল হবে 6174 এবং পরবর্তীকালে বিয়োগফল হিসেবে 6174 ই আসবে। এই 6174 চার অঙ্কের কাপ্রেকার ধ্রুবক অনুরূপভাবে তিন অঙ্কের কাপ্রেকার ধ্রুবক 495।

উদাহরণ ঃ চার অঙ্কবিশিষ্ঠ একটি সংখ্যা 1524 (যার সব অঙ্কগুলি সমান নয়)

1, 5, 2, 4 দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা =5421

1, 5, 2, 4 দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = 1245

5421 - 1245 = 4176

4176 – 7641 - 1467 = 6174

6174 – 7641 - 1467 = 6174

২) কাপ্রেকার সংখ্যা ঃ শুরু করা হোক 45 এর বর্গ দিয়ে।

$45^2 = 2025$

2025 অর্থাৎ 45 এর বর্গকে সমান দুটি অংশে ভাগ করলে পাওয়া যায় 20 ও 25 এখন 20+25=45

অনুরূপভাবে $(297)^2=88209$

88209 এর ২টি অংশ 88 ও 209 (বড় সংখ্যা ডান দিকে থাকবে) 88+209=297

কোনো সংখ্যার বর্গকে এইভাবে ২টি ভাবে বিভক্ত করে যোগ করে যোগফল যদি প্রকৃত সংখ্যাটি হয়, তাহলে সংখ্যাটিকে কাপ্রেকার সংখ্যা বলা হয়। যেমন - 9, 4879, 17344 প্রভৃতি।

৩) দেবলালি সংখ্যা (বা Self Number) ঃ Self Number বা স্বয়ম্ভু সংখ্যা সম্বন্ধে বলতে গেলে আগে জানা দরকার কোন সংখ্যার Digitaddition সাথে তার অঙ্কগুলির যোগফল নির্ণয় করার পদ্ধতি Digitaddition।

যেমন 15 এর Digitaddition করলে পাওয়া যায়, 15+1+5=21 অনুরূপভাবে 75 এর Digitaddition করলে পাওয়া যায় 75+7+5=87 এই পদ্ধতিতে 21 এর generatar এর 15, 87 এর generatar 75, এই পদ্ধতিতে অনুসরণ করলে কিছু সংখ্যার একাধিক generatar পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু সংখ্যা এমনও আছে যাদের এরূপ কোনো generatar পাওয়া যায় না। এই ধরণের সংখ্যাগুলিকে দেবলালি সংখ্যা বা Self Number বলা হয়। যেমন 1, 3, 20, 42, 121 .... প্রভৃতি।

৪) হর্ষদ সংখ্যা ঃ স্বাভাবিক সংখ্যার জগতে কাপ্রেকারের আরেক অবদান হর্ষদ সংখ্যা অর্থাৎ সেই সংখ্যা যা আনন্দ দেয়। এই সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য এরা নিজেদের অঙ্কগুলির যোগফল দ্বারা বিভাজ্য হয়। যেমন 12 তার অঙ্ক দুটির যোগফল 1+2=3 দ্বারা বিভাজ্য। অন্যান্য কয়েকটি হর্ষদ সংখ্যা হল 20, 21,180 প্রভৃতি।

৫) ডেম্লো সংখ্যা ঃ তৎকালীন বোম্বে ষ্টেশন থেকে 30 মাইল দূরে অবস্থিত ডেখ্লো ষ্টেশনে বসে কাপরেকারের মনে এই সংখ্যাগুলির অধ্যয়নের সূচনা ঘটে। সে সব সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক 1 তাদের Repunit সংখ্যা বলে। যেমন 1, 11, 111... ইত্যাদি। দেখা গেল এই সংখ্যাগুলির বর্গও একটি নির্দিষ্ট ছন্দ মেনে চলে যথা—

$(1)^2=1$

$(11)^2=121$

$(111)^2=12321$

$(1111)^2=1234321$

Repunit সংখ্যার বর্গকে হল ডেম্লোর সংখ্যা।

সত্যিই ভাবা যায় না, কী করে কোনওরকম সাহায্য উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ছাড়া দিনের পর দিন এক বিজ্ঞান অন্বেষক তার অবদানে গণিত জগতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। হয়ত বিস্মৃতির ধোয়াশায় হারিয়েই যেত তাঁর অসামান্য কীর্তি যদি না 1976- এ মার্টিন গার্ডেনের Scientific American' এ কাপ্রেকার ও তাঁর কাজের কথা না লিখতেন।

এ কথা ঠিক যে আজও এই অসাধারণ গণিতবিদ সর্বজনবিদিত নন, তাও গণিতের জগতের তিনি হয়ে থাকবেন চিরশাশ্বত কাপ্রেকার ধ্রুবক কাপ্রেকার সংখ্যা, দেবলালি সংখ্যা, হর্ষদ সংখ্যা, ডেম্লো সংখ্যা দের মাধ্যমে।

যোগাযোগ ঃ সহ শিক্ষিকা, যোতশিবরামপুর গার্লস হাইস্কুল, দঃ ২৪ পরগনা, যোগাযোগ ঃ ৯৭৪৮৬৮৫২৮০

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

১) ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিজ্ঞান অন্বেষক ও চাকদহ বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সংস্থা যৌথ ভাবে কাঁচরাপাড়া, মদনপুর ও চাকদহ ষ্টেশনে সারাদিন ব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচী পালন করেন। সদস্যরা পরিবেশের জলাভূমি বাঁচাও, গাছ বাঁচাও সহ পোষ্টার, বই, পত্র পত্রিকা সহ প্রচার চালায়।

২) ১৮ জুন বিজ্ঞান অন্বেষক সংস্থার কার্যালয়ে ১৬ টেলার রোড, কাঁচরাপাড়া পরিবেশ ও আবর্জনা শীর্ষক আলোকচিত্রসহ আলোচনা করেন কল্লোল রায়। বক্তা পরিবেশের আবর্জনা ও দূষণ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সহ আলোচনা করেন।

৩) ২২ জুন পলাশী আচায্য দুর্গাপ্রসন্ন গালর্স হাইস্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা ড. মাধবী ভট্টাচার্য্য বলেন পরিবেশ দূষণ সমস্যাটি বর্তমানে ভীষণ ভাবে বেড়ে চলেছে। পরিবেশ ও পরিবেশের জীবনযাত্রা শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কল্লোল রায়। সাপ ও পরিবেশ আলোকচিত্র সহ বক্তব্য রাখেন জয়দেব দে। স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞান ও পরিবেশ কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বিপদ থেকে পরিত্রাণ - মনোবিজ্ঞানের আলোকে

তপন চন্দ

সারা ইউরোপ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের তান্ডব। দুর্ধর্ষ জার্মান ফৌজ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। জলে, স্থলে, আকাশে ইংরেজ আর ফরাসী সেনাও মরণপণ লড়াইয়ে শত্রুর ওপর পাল্টা আঘাত হানছে। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে দেশের অন্যান্য যুবকের সাথে কেমব্রিজের মেধাবী ছাত্র রোনাল্ড নিকসনেরও ডাক পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে রয়েল এয়ার ফোর্সে নাম লেখালেন। স্বল্পকালের মধ্যেই দক্ষ ও দুঃসাহসী পাইলট হিসেবে নিকসন বিমানবাহিনীতে সুনাম কুড়োলেন।

গোপন বার্তা এল, জার্মানের দখলে থাকা একটি বেলজিয়াম যুদ্ধঘাঁটিতে শত্রুপক্ষ হামলার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, মজুত করেছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। নির্দেশ এল অনাতিবিলম্বে ওই ঘাঁটির ওপর আক্রমণ হানতে হবে। সাথে সাথে কয়েকটি বোমারু বিমান দুরন্ত বেগে আকাশে উড়ল। একটি বিমানের চালক নিকসন।

বেলজিয়ামের আকাশে ঢোকার আগেই গোপন ঘাঁটি থেকে উড়ে একদল জার্মান ফাইটার বিমান। আচমকা নিকসনের নজরে পড়ল জার্মান ফাইটারগুলো ক্ষিপ্রবেগে তাঁকে ঘেরাও করার জন্য ধাওয়া করেছে। নিকসন প্রমাদ গুনলেন।

এমনই এক মানসিক বিপর্যয়কর অবস্থায় নিকসেনর চোখের সামনে আকাশ জুড়ে ভেসে উঠল এক দৃশ্য। তুষারাবৃত এক পর্বত, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, আর সেই পর্বতের গুহা থেকে উজ্জ্বল আলোকধারা নির্গত হচ্ছে। সেই আলোর তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছে নিকসনের চেতনা। ক্ষণপরেই এক দিব্যভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি। জ্ঞান ফিরে আসলে দেখেন বিমানের ককপিটে বসে নয়, রয়েছেন লন্ডনের একটি সামরিক হাসপাতালে। তাঁর বিমানটি ইংল্যান্ডের এক বিমানঘাঁটিতে নামলে দেখা যায়, পাইলট নিকসন মূর্ছিত অবস্থায় ঢলে পড়ে আছেন। সেখান থেকে উদ্ধার করে আহত নিকসনের তাড়াতাড়ি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয়। ঐশ্বরিক শক্তিই তাঁকে শত্রুব্যূহ থেকে রক্ষা করেছে মনে করে নিকসন ভাবাপ্লুত হলেন। ঈশ্বরের অপার করুনা তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে ভেবে ভক্তি, শ্রদ্ধায়, আনন্দে নিকসেনর মনপ্রাণ ভরে গেল। অন্তরে অনুভব করলেন কে যেন অস্ফুটস্বরে বলে উঠছে, 'হিমালয় দেখেছ তুমি সে দিন 'অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। পবিত্র হিমালয়ের গুহায় থাকেন যে যোগীঋষি, তাঁদের কৃপা তুমি পেয়েছ। সেই কৃপাই সেদিন তোমাকে অনিবার্য মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছে'। ঘটনা নিকসনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের তীব্র বাসনায় ভারতে পাড়ি দিলেন। সাধারণ জীবনে সন্ন্যাস লাভের পর রোনাল্ড নিকসন হলেন বৈষ্ণবসাধক 'কৃষ্ণপ্রেম'।

ইংল্যান্ডের এক ধর্মপরায়ণ, গোঁড়া, রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে নিকসনের জন্ম। পারিবারিক সংস্কারের প্রভাবে শৈশব থেকেই প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি পরমবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। কলেজে পড়াশোনা করার সময় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতুহল বাড়ে। এই সময়ে খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধদর্শন ও থিয়োসফির ওপর কিছু কিছু বইপত্র পড়ে ফেলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১ম বিশ্বযুদ্ধের কারণে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পড়াশোনায় ইতি টেনে ফৌজে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মন থেকে মুছে গেলনা আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি তাঁর অদম্য আকর্ষণ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশ, হত্যা, রক্তপাত তাঁর মস্তিষ্ক কোষকে আচ্ছন্ন করেছিল। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে মস্তিষ্ক কোষের সহনশীলতা হারিয়ে মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়। নিকসনও এদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। গভীর ধর্মীয় সংস্কার, ভারতের সাধুসন্তের 'অলৌকিক' ক্ষমতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, শত্রু বিমানের মুখোমুখি সঙ্কটকালীন মুহূর্তে চরম মানসিক উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, ভারতের আধ্যাত্মজগতের রহস্যময়তার প্রতি দুর্নিবার টান নিকসেনর মধ্যে অলীক দর্শনাভূতির সৃষ্টি করেছিল। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'হ্যালুসিনেশন', যার আভিধানিক অর্থ 'অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস'। মনোবিজ্ঞানীদের মতে বাস্তবে যা নেই তার অনুভূতি লাভ করাকেই 'হ্যালুসিনেশন' বলে, বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অলীক প্রত্যক্ষ'।

অলীক দর্শণের এই দৃষ্টন্তটি শঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' গ্রন্থের সুলভ সংস্করণের একাদশ খন্ডে আছে। হলিউডের অ্যাকশন প্যাক্ড থ্রিলারের ঢঙে যুদ্ধকালীন বিমান আক্রমণের বর্ণনায় গ্রন্থকার যতটাই উৎসাহী, নিকসনের বেঁচে ফিরে আসার কারণ অনুসন্ধানে ততটাই নিস্পৃহ। আসলে ঘটনাটিকে রহস্যাবৃত রেখে 'অলৌকিকতার' মোড়কে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। তাই শত্রুবিমানের হামলা এড়িয়ে কীভাবে নিকসন মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেন তার যুক্তিসম্মত উত্তর দেননি; এ ব্যাপারে তাঁর সদিচ্ছা বা আন্তরিকতা কোনোটাই ছিল না, বরঞ্চ তিনি নিকসনের জীবনসঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার কারণ হিসেবে এক অজানা দৈবশক্তিকেই মহিমান্বিত করেছেন। শঙ্করবাবুর মতে, নিকসনের অলৌকিক দর্শনই সেই ঐশ্বরিক সত্তার প্রমাণ।

যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে অবাস্তব ঘটনাকে প্রমাণ ছাড়া মানা যায়না। অলৌকিক কথাটির আভিধানিক অর্থ লৌকিক নয়, ইহলোকে সম্ভব নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যা লৌকিক নয় তা তো লৌকিক জগতে ঘটতেই পারে না। অর্থাৎ অলৌকিক বলে কিছু নেই। চালকহীন বিমানের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওড়া এবং নিরাপদে অবতরণ অসম্ভব। শত্রুপক্ষের বিমানের আচমকা হামলায় নিকসন যে মানসিক জটিলতার শিকার হয়েছিলেন তা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ট্রানসিয়েন্ট সাইক্রিয়াটিক ইমার্জেন্সিস বা আকস্মিক মানসিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। এই সঙ্কটকালীন অবস্থায় পড়লে প্রথমে বিপদের মুখোমুখি হয়ে একটা সচকিত, ভয়মিশ্রিত সজাগভাব আসে। তারপর বিপদাপন্ন মানুষটি শরীর মনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উপস্থিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেন। অতিরিক্ত মানসিক চাপে তাঁর স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাঁর স্মৃতিবৈকল্য ঘটতে পারে এবং একটা ঘোরের ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে। এই অবস্থায় সে সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল হতে চায় এবং যন্ত্রচালিতের মত ব্যবহার করে। নিকসনও খুব সম্ভব এমনই মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু এই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও অনুমান করা যায় যে, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিজনিত আবেগ তাঁর বিমানচালনার পরাবর্তকে সক্রিয় রেখেছিল। পুলিশের গাড়ির তাড়া খেয়ে অপরাধী যেমন প্রচন্ড গতিতে গাড়ি চালিয়েও দূর্ঘটনা এড়িয়ে

এরপর 7 পাতায়

মৌমাছি ও মধু

1 পাতার পর

গ্রাম, ফ্যাট ০.২ গ্রাম, স্টার্চ ৭৯.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.৫ মিগ্রা, ফসফরাস ১৬ মিগ্রা, আয়রণ ০.৯ মিগ্রা, ভিটামিন সি ০৪ মিগ্রা, বি২-০.০৪ মিগ্রা, নিয়াসিন - ০.০২ মিগ্রা।

মৌমাছি ৫ লক্ষ ফুলের মকরন্দ সংগ্রহ করে এক কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন করে। তারা যতবার উড়ে তা হিসাবে চারবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার মত। একটি মৌচাকে (যা শ্রমিক মৌমাছিরা তৈরী করে) প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক মৌমাছি থাকে যারা বিভিন্ন স্থানের ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করার দিক দর্শন, দূরত্ব প্রভৃতি সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী কোমর দুলিয়ে শ্রমিক মৌমাছি পরস্পর পরস্পরকে জানায়। ১৯৪৬ সালে কার্ল ফন ফ্রিৎস মৌমাছিদের ভাষা সম্পর্কে আবিষ্কার করেন। ফ্রিৎস লক্ষ্য করেন যে মৌমাছিরা মকরন্দ সংগ্রহ করে চাকে ফিরে দুরকমের নাচ নাচে। একটি নাম দেন, গোল নাচ আর একটির নাম দেন, ল্যাজ নাড়া নাচ। গোল নাচের অর্থ হল যে সেই নাচিয়ে মকরন্দ সন্ধান দিয়েছে অন্য মৌমাছিদের। ল্যাজ নাড়া নাচের অর্থ হল কোথায় মকরন্দ পাওয়া যাবে। গোল নাচ দূরত্বের নির্দেশ দেয় মকরন্দ ৪০-৫০ মিটারের মধ্যে পাওয়া যাবে। ল্যাজ নাড়া নাচ নির্দেশ দেয় একশ মিটারের থেকেও আরও দূরে। গোল নাচে এক জায়গায় থেকে ফিরে প্রথমে একদিকে ও পরে অপর দিকে নাচে। ল্যাজ নাড়া নাচে বাংলার চার বা ইংরেজি আটের মতো ভঙ্গিতে। এখানে কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-র একটি ছড়া উল্লেখ করা যেতে পারে।

মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি-নাচি।
দাঁড়াও না একবার ভাই।

এখনকার দিনে অনেকে বাড়িতে বাক্স মধ্যে মৌমাছি পালন করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফুলের অপ্রতুলতা হেতু চিনির দ্রবণ কাছাকাছি রাখেন। ওই জল মৌমাছি খায় ফুলের মকরন্দের পরিবর্তে। এর ফলে যে মধু পাওয়া যায়, কৃত্রিম মধু, প্রাকৃতিক নয়, প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন হলেও। এই ভেজালের যুগে মধুর বিশুদ্ধতা নিয়ে নানা জনের নানান প্রশ্ন। মধুটা মোটামুটি মধু কিনা তা জানার জন্য একটি সহজ ছোট্ট পরীক্ষা বাড়িতে বসে সকলেই করতে পারেন।

একটি কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস জল নিয়ে তাতে এক ফোঁটা মধু ফেলে দিলে যদি ওই ফোঁটা গ্লাসের তলদেশ পর্যন্ত ওই অবস্থায় পৌঁছায় ও অবিকৃত থাকে তবে সেটা মধু কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে তা ভেজাল যুক্ত।

তাছাড়াও মধুতে চিনি গোলা জল বা ইনভার্ট সুগার অনেক সময় মেশান হয়। তা ধরার জন্য একটা কাঠিতে মধু লাগিয়ে আগুনে ধরতে হবে এবং যদি জ্বলে ওঠে তবে মধুতে ভেজাল মেশান নাই বুঝতে হবে। আর যদি আগুন না ধরে চড়চড় করে তাহলে চিনি গোলা জল মেশান আছে। ইনভার্ট সুগার মধুতে মেশান আছে কিনা তা জানার জন্য একটা পাত্রে কিছুটা মধু নিয়ে তাতে কিছুটা ইথার দ্রাবক মিশিয়ে পাত্রটা খোলা অবস্থায় রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে ইথার উড়ে যাবে এবং পাত্রে একটি অধঃক্ষেপ পড়ে থাকবে। এরপর তাতে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লেরিক অ্যাসিডযুক্ত রেসরসিনল দিয়ে মিশ্রণের রং লাল হয় তাহলে মধুতে ইনভার্ট সুগার আছে।

একবিংশশতকে বিজ্ঞান উন্নত। তাই কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবে ঢালাও কীটনাশক ব্যবহার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার। কীটনাশক সমস্ত বাস্তুতন্ত্র দূষিত করে দিয়েছে। তাই মধুর মধ্যে কীটনাশকের অবশেষ। সে প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যাই হোক না কেন। বর্তমানে মধুতেও অ্যান্টিবায়োটিক। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে The centre for Science and Environment (C.S.E.) নানা কোম্পানির মধুতে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন। এই সংস্থার বক্তব্য সরকারি খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক ভারতে যে মধু ব্যবহার হয়, তার দিকে অন্ধ ভাবে, এই অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি এড়িয়ে চলেন কিন্তু বিদেশে যে মধু পাঠানো হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি দেন। এই C.S.E. এর তথ্য অনুযায়ী যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক মধুতে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হল Oxytetracycline, Ampicillin, Enrofloxacin, Erythromycin, ciprofloxacin, Chloramphenicol (Source : Centre for Science and Environment) প্রভৃতি।

এই সকল অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের খাদ্য নালিতে সামান্য পরিমাণে পৌঁছে ওই খানের ব্যাকটেরিয়াগুলিতে ওষুধ প্রতিরোধক্ষম গড়ে তোলে যার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের রোগ চিকিৎসার প্রয়োজনে সেবনে রোগ সারতে চায় না। মধুতে যে অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায় তার পরিমাপ হল ০৩.৭ মাইক্রোগ্রাম থেকে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রামে। সর্বোচ্চপরিমাণ ২০ গ্রাম মধুতে ০৫ মাইক্রোগ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আছে।

মধু নানা প্রকার ওষুধে ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথে মৌমাছির বিষ থেকে Apis ওষুধ তৈরি হয়। আচার্য কেন্ট বলেন প্রাচীন মহিলাগণ সদ্যোজাত শিশুর প্রস্রাব না হলে দু-একটি মৌমাছি জলে সেদ্ধ করে সেই জল শিশুকে খেতে দিতেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাতিলেবুর রসের সঙ্গে মধু অল্প উষ্ণ জলে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে স্থূলকায় ব্যক্তির দৈহিক ওজন কমে। দুর্বল শরীরে দু-চামচ মধু গরম দুধে মিশিয়ে সকালে বা রাত্রে শোয়ার আগে খেলে ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাশি ও সর্দির জন্য সমপরিমাণ টাটকা তুলসি পাতার রস ও আদার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডকে কমিয়ে গাঁটের বাত রোগ ও পেশির বাত রোগের ক্ষেত্রে ও দেহে কোথাও পুড়ে যাওয়া, ফোলা ও যন্ত্রণা কমাতে মধু উপকারী।

যোগাযোগ ঃ নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর,
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

২৪ জুন ২০১৬ বিরহী গ্রামের বেদেপাড়ায় সাপ সংরক্ষণ ও সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেন অনুপ হালদার ও নীলেন্দু কেশ।

বিপদ থেকে পরিত্রাণ

5 পাতার পর

পালিয়ে যেতেপারে তেমনি প্রবল উত্তেজনার আবেশেও একজন দক্ষ বৈমানিকের 'রিফ্লেক্স' বিমানের ওপর নিকসনের নিয়ন্ত্রণ হারাতে দেয়নি। জার্মান ফৌজের চোখে ধুলো দিয়ে নিকসন নিজেই নিরাপদে স্বদেশের এরোড্রামে বিমান অবতরণ করাতে পেরেছিলেন, এমনটা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পরমুহূর্তেই হয়ত তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। কারণ শত্রুর ফাইটার বিমানের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে প্রচন্ড মানসিক চাপ, ভয়, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ তাঁর মস্তিষ্কের কোষ কোষে যে অতিপীড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সঙ্কটকালীন মুহূর্তে মৃত্যুভয়ের প্রবল প্রক্ষোভ বা আবেগ সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁর মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা স্বাভাবিক ক্ষমতার চেয়ে অনেকগুন বেড়ে গিয়েছিল। তাই বিমান চালাতে চালাতে তিনি অজ্ঞান হননি। বিপদমুক্ত হওয়ার পর ভয়ের প্রক্ষোভ প্রশমিত হয় এবং মস্তিষ্ককোষ তখন আর উত্তেজনার জোরাল অভিঘাত সহ্য করতে না পারায় নিকসনের সংজ্ঞা লোপ পায়। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর সংজ্ঞা হারানো মোটেই অসম্ভব নয়। বাস্তবজীবনে এমন অনেক ঘটনার কথা জানা যায় যে, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবল থেকে ফিরে এসে অনেকেই চেতনা হারিয়ে ফেলেন।

ঘটনায় অনুমান করা যায় যে, শত্রুবিমান যখন আকাশে ধাওয়া করেছিল তখন নয়, নিকসনের অলীক প্রত্যক্ষ হয়েছিল বিমান অবতরণের পর সংজ্ঞা হারাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে। এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই কারণে যে, চেতনা হারানোর আগে উত্তেজনা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার দরুন মস্তিষ্কের সন্নিহিত কোষগুলোর দ্রুত নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নিস্তেজনা যখন প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ এ পৌঁছায় তখনই নিকসনের কাছে কল্পনার হিমালয় পর্বত/পর্বতমালা বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞান ফিরে আসার পর আকস্মিক মানসিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার ফলে তাঁর স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সে কারণেই ঘটনা ক্রমপরম্পরার সূত্র হারিয়ে ফেলে আকাশে উড়ানোর সময়েই তাঁর দিব্যদর্শণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে নিকসন মনে করেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস তাঁকে আরও বেশি করে এই ধারণার দিকে ঠেলে দেয়। স্মৃতিবৈকল্যের ফলে কেমন করে তিনি শত্রু পক্ষের বিমানকে ফাঁকি দিয়ে স্বদেশের বিমানঘাঁটিতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন সে কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। আর তাই ঐশ্বরিক শক্তিই তাঁকে রক্ষা করেছে, এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হন।

জার্মান মনোবিদ ভার্নিস এর সেন্টাল থিয়েরি বা কেন্দ্রীয় তত্ত্ব অনুসারে হ্যালুসিনেশনের জন্য মস্তিষ্কের কোষবিশেষের উত্তেজনা দায়ী। কৃত্রিমভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে উত্তেজনা ও নিস্তেজনা তৈরি করে নানা ধরণের অলীক প্রত্যক্ষ ঘটানো সম্ভব। সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে ডেলগাডো ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেমস ওল্ডস মস্তিষ্কে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে প্রেম, ঘৃণা, ভয়, উদ্বেগ, আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করাতে পেরেছেন। একইভাবে কৃত্রিম উত্তেজনার সাহায্যে কাল্পনিক ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বরের বাণী শোনার মত অনুভূতি সৃষ্টি করাতে পেরেছেন।

(সংক্ষিপ্ত; কৃতজ্ঞতা ও ঋণস্বীকার - মাননীয় রাজেশ দত্ত)

যোগাযোগ ঃপোঃ ও গ্রাম-মাদারিহাট, জেলা-আলিপুরদুয়ার, মোঃ-৯৭৩৩১৫৩৬৬১

ভুরিভোজের পরে

1 পাতার পর

সিগারেট খাওয়া এক সঙ্গে ১০টি সিগারেট খাওয়ার সমান। এতে ধুমপানের অপকারিতা যথা - ফুসফুস, গলা ও পেটের ক্যান্সারের সম্ভাবনা তিনগুন বাড়িয়ে দেয়।

২। স্নান করা ঃ- বিশেষজ্ঞরা বলেন খাওয়ার পরে স্নান করা উচিত নয়। পেট ভর্তি থাকার সময় স্নান করলে তা হজম প্রক্রিয়া বাধা দেয়। ফলে আপনি চট করে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

৩। নাচ ঃ- নাচ শরীরের উপকারি ব্যায়াম। কিন্তু এটি ব্যায়ামের চূড়ান্ত পর্যায়। খাওয়া দাওয়ার পরই যদি আপনি ভর্তি পেটে নাচ করতে শুরু করেন, তাহলে তা হজম পদ্ধতিকে অতি ত্বরান্বিত করে,যা কখনওই উচিত নয়। এতে পেটের উপর চাপ পড়ে। আপনি অসুস্থ বোধ করতে পারেন।

৪) জোরে হাঁটা ঃ- আপনার ডায়াবেটিস আছে কিংবা আপনি উচ্চ রক্ত চাপের রোগী। ডাক্তাররা আপনাকে জোরে হাঁটতে পরামর্শ দেবেন। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর এটি করতে যাবেন না। শরীরে খাবারের পুষ্টি গ্রহনের ক্ষমতা এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব হতে পারে।

৫) ফল খাওয়া ঃ- লাঞ্চ বা ডিনারের মতো ভারী খাবারের পর সঙ্গে সঙ্গে ফল খাবেন না। ফল সব সময় খাবার আগে খাওয়া উচিত।

৬) খাওয়ার মাঝে বা খাবার শেষ করেই ঠান্ডা জল পান ঃ- ঠান্ডা জল শরীরের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। ঠান্ডা জল শরীরে মেদ জমাতে সাহায্য করে। এর উপর খাওয়ার পরেই ঠান্ডা জল খেলে তা হজম পদ্ধতিতে বাধাপ্রাপ্ত করে। শরীরকে অসুস্থ করে।

৭) ঘুমানো ঃ- ভারী খাবারের পর সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শোয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ খাওয়া দাওয়ার পর হজম হওয়ার জন্য আমাদের খাদ্যনালীতে উৎসেচক নিঃসৃত হয়। কিন্তু শুয়ে পড়লে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎসেচক সীমাবদ্ধ হয়। এবং অন্ননালীর একটি স্তরকে জ্বালাতে শুরু করে। ফলে অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা দেখা দেয়।

৮) গরম চা ঃ- অনেকে আছেন যারা খাওয়া দাওয়ার পর গরম চা খান। এটি অস্বাস্থ্যকর একটি অভ্যাস। গরম চা খাবারের প্রোটিন শুষে নেয়। এমনকি চায়ের মধ্যে যে ট্যানিন যাকে তা খাবারের আয়রনকে নষ্ট করে দেয়। ফলে শরীরে আয়রণের অভাবে অ্যানিমিয়া হতে পারে।

যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ কর্মী অমিত নন্দী।

কালাচ (Common Krait)

নীলেন্দু কেশ

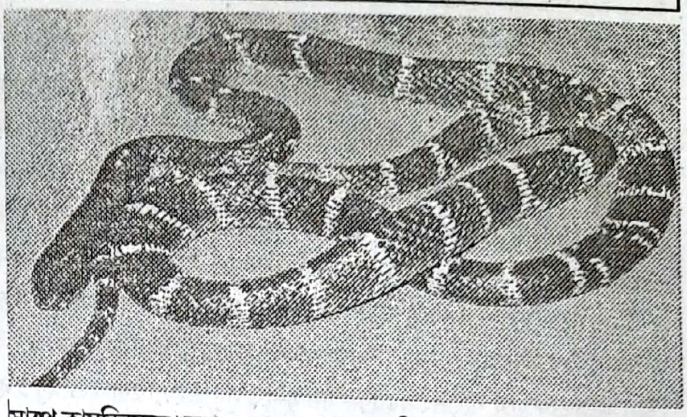

স্থানীয় নাম ঃ বাংলা ঃ কালাচ, ডোমনাচিতি, শিয়র চাঁদা। হিন্দি ঃ করাত।

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Bungarus caeruleus*, Family : Elapidae

ভারতবর্ষের সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়, উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতল থেকে ১৭০০ মিটার উচ্চতায় এদের বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি এবং সুন্দরবনে এদের বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্থানে এদের পাওয়া যায়।

চিনব কেমন করে ?

প্রধানত কালো রঙের হয়, আঁশ অমসৃন এবং চকচকে। কখনো কখনো হালকা নীল আভা যুক্ত কালাচও দেখা যায়। সদ্য খোলস ছাড়ার পরও নীলচে ভাব দেখা যায় এদের। মাথাটা ঘাড়ের থেকে সামান্য চওড়া। এদের ফনা বা Hood নেই। পুরো শরীরে প্রায় ৪০টা সাদা রঙের আড়াআড়ি দাগ থাকে। পেট সাদা হয়, কশেরুকার উপস্থিত আঁশগুলো ছয় কোনা আকৃতির। চোখ তুলনামূলক ভাবে ছোট, চোখের তারা গোলাকার। লেজ তুলনামূলক ভাবে ছোট।

দৈর্ঘ্য ঃ জন্ম মুহূর্তে এদের গড় দৈর্ঘ্য হয় ২৬-২৭ সেমি পরিণত অবস্থায় গড় দৈর্ঘ্য ৯০-১২০ সেমি।

কোথায় থাকতে পছন্দ করে ?

প্রধানত সমতল এলাকার সাপ। তবে জলা জায়গা এদের বেশী পছন্দের। ঝোপ, জঙ্গল, ঝোপ, জঙ্গল, উইঢিবি, ইঁদুরের গর্ত, ভাঙা ইটের স্তূপ, পরিত্যক্ত বাড়ির ফাটলে, এদের থাকতে দেখা যায়।

চালচলন ঃ দিনের বেলায় প্রধানত নিজেদের লুকিয়ে রাখে এবং রাত্রিবেলায় শিকারে বের হয়। বিকালের পর থেকেই এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুরুষ কালাচ সাপ নিজের এলাকা এবং পৌরুষের ব্যাপারে অনেকটা সচেতন। এদের এলাকার ভেতর অন্য কোনো পুরুষ কালাচ এর প্রবেশ মেনে নেয় না। গরমকালে রাত্রে গ্রাম্য অঞ্চলের গৃহস্থ বাড়িতে প্রবেশ করে এবং বালিশ বা চাদরের তলায় গুটি মেরে বসে থাকে এবং কারো অজান্তেই ঘুমন্ত মানুষকে নড়াচড়া করলে কামড়ে দেয়।

বিষের প্রভাব ঃ আধ ঘন্টা থেকে আট ঘন্টার মধ্যে এর বিষের প্রভাব শুরু হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কামড় বোঝা যায় না। কারণ কালাচের দাঁত খুব ছোট হয়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থান ফুলে ওঠে না। শরীরে দুর্বলতা অনুভূত হয়। চোখের পাতা বুজে আসে বা অবসন্ন হয়ে পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, গা গোলাতে থাকে, পেটে ব্যাথা শুরু হয়। ঠোঁট ভারী হয়ে আসে বা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তি জানতেই পারেন না যে তাকে কালাচ সাপে কামড়িয়েছে। অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি গা গোলানো বা পেট ব্যাথার জন্য ভাবেন যে হজমের গন্ডগোল হয়েছে। সঠিক চিকিৎসা না হলে ৫-১২ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত।

বিষরোধী সিরাম ঃ পলিভ্যালেন্ট সিরাম সরাসরি শিরার মধ্যে যতশীঘ্র সম্ভব ইনজেক্ট করা দরকার। ভারতবর্ষে এই সাপের বিষরোধী সিরাম পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ ঃ ভারতীয় বন্য প্রাণী রক্ষা আইন (১৯৭২) এর Schedule-IV অনুযায়ী এই সাপ সংরক্ষিত এই সাপ সংরক্ষিত। এই সাপ ধরা বা মারা আইনত দন্ডনীয়। এই সাপের মত দেখতে অন্য সাপ ঃ ঘরচিতি

বিশেষ তথ্য ঃ এই সাপটি ভারতের সবচেয়ে ক্ষতিকারক চারটি সাপের মধ্যে অন্যতম। খাদ্যাভাস এই সাপের একটু অন্য রকমের। এদের খাদ্য তালিকায় অন্ধ সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, ইঁদুর তো রয়েছেই এর সাথে এর নিজের প্রজাতির সাপকেও খেয়ে ফেলে। এই কারণে এদের স্বজাতি ভক্ষক সাপও বলা হয়।

বংশগতি ঃ জানুয়ারির শেষ থেকে মার্চ এর মধ্যে এদের প্রজনন দেখা যায়। যেহেতু কালাচ স্বজাতি ভক্ষক তাই প্রজননের সময় এরা সতর্ক থাকে। স্ত্রী কালাচ ৩-১৫টা ডিম পাড়ে এবং মে-জুলাই মাসে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। জন্মানোর এক বছরের মধ্যে এদের দৈর্ঘ্য দ্বিগুন হয়ে যায় এবং দু বছরের মধ্যে তিনগুন বড় হয়ে যায়। স্ত্রী সাপ বাচ্চা ফোটা অবধি সেগুলিকে রক্ষা করে।

বিষ ঃ ভারতে পাওয়া সাপের মধ্যে কালাচের বিষ সব থেকে মারাত্মক বলা যায়। ভারতে প্রথম এবং বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শুধুমাত্র এর বিষের জন্য। একবার কামড়ালে ২০-২২ গ্রাম বিষ ঢালে কালাচ। যদিও কালাচের লেথাল ডোজ ০.৫ গ্রাম। বিষ এক সাথে হিমোটস্কিক ও নিউরোটস্কিক যা ভারতীয় কোবরা জাতীয় সাপের বিষের প্রায় ১৪-১৫ গুন বেশী। শ্বাস প্রশ্বাসের কেন্দ্রকে প্যারালাইসিস করে দেয়। লোহিত রক্ত কনিকাকে নষ্ট করে দেয়। এবং মৃত্যুর কারণ রূপে Asphyxia (যা প্রধানত শ্বাসরোধ করে দেয় অক্সিজেনের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। শ্বাস প্রশ্বাসে জড়িত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে প্যারালাইস করে দেয়) দেখা যায়।

যোগাযোগ ঃ ৭২৭৮২২৯৪৮৪

যোগাযোগ—বিজ্ঞান অন্বেষক ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in

bijnandarbar1980@gmail.com